চতুর্থ অধ্যায়

মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health)

[মানসিক স্বাস্থ্যের ধারণা, সংজ্ঞা, স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য; মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মানসিক স্বাস্থ্যের নির্ধারকসমূহ, মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা; মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার্থে বিদ্যালয়ের ভূমিকা]

● মানসিক স্বাস্থ্যের ধারণা (Concept of Mental Health) :

দৈহিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমরা সকলেই কম-বেশি সচেতন। শৈশবকাল থেকেই দৈহিক স্বাস্থ্য কি এবং তা রক্ষার জন্য গৃহে পিতা-মাতা ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ী, বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা, পাড়া-প্রতিবেশী, গুরুজন এমনকি পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে আমাদের সচেতন প্রয়াসের কোন বিরাম নেই। মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিন্তু একথা প্রযোজ্য নয়। বস্তুত মানসিক স্বাস্থ্য কি, কিভাবে সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় এ সম্পর্কে বেশিরভাগ ব্যক্তিই অজ্ঞ বা আংশিক জ্ঞানসম্পন্ন। অথচ সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হলে দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই বিচার করা প্রয়োজন। কথায় বলে 'Sound mind in a sound body'। কেবলমাত্র সুস্থ দেহই যথেষ্ট নয়, সুস্থ মনেরও অধিকারী হতে হবে। তাই মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান সকলেরই থাকা প্রয়োজন বিশেষ করে শিক্ষক এবং এই বৃত্তিতে যারা জড়িত।

● মানসিক স্বাস্থ্য কাকে বলে (What is Mental Health) :

মানসিক স্বাস্থ্য কাকে বলে এ সম্পর্কে যাঁরা এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সেইরকম কতিপয় মনোবিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। নিউ ইয়র্কের White House Conference (1930)-এ মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাখ্যাটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে—"Mental Health may be defined as the adjustment of the individuals to themselves and the world at large with a maximum of effectiveness, satisfactory, cheerfulness, and socially considerate behaviour, and the ability of facing and accepting the realities of life." অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্য হল সর্বাধিক কার্যকরীভাবে, সন্তোষজনক উপায়ে, আনন্দের সঙ্গে এবং সমাজ বাঞ্ছিত আচরণের দ্বারা ব্যক্তির নিজের ও বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সঙ্গতিস্থাপন করা এবং জীবনের বাস্তবতাকে স্বীকার করে তার সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা।

কার্ল মেনিঞ্জার (Karl Meninger, 1957) প্রায় একই কথা বলেন—"Mental Health is not just efficiency or contentment or complacent abiding by the

rules. It is just adjusting process that involves a maximum of effectiveness and happiness." অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্য শুধু উৎকর্ষতার সঙ্গে, সন্তোষজনকভাবে এবং আত্মতুষ্টির সঙ্গে নিয়ম অনুসরণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটা হল সর্বাধিক কার্যকারিতা এবং সর্বাধিক আনন্দের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়া। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মানবিক অনুশাসন, সক্রিয় বুদ্ধি এমনকি মেজাজ। বাস্তবকে এখানে স্বীকার করা হয়। সম্ভবমত সমস্যা সমাধান করা হয়। অধ্যাপক হ্যাডফিল্ডের মতে, "Mental Health is the full and free expressions of all our native and acquired potentialities in harmony with one another by being directed towards a common end or aim of the personality as a whole." অর্থাৎ মানসিক স্বাস্থ্য হল জন্মগত ও অর্জিত প্রবণতা সমূহের পরিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এবং সু-সংহত বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে সাধারণ লক্ষ্য বা সমগ্র ব্যক্তিত্বকে সঠিক দিকে পরিচালিত করা।

এই বক্তব্যে মানসিক স্বাস্থ্যের তিনটি শর্তের উল্লেখ আছে।

প্রথমত, জন্মগত ও অর্জিত প্রবণতা সমূহের পরিপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ অর্থাৎ জন্মগত সূত্রে প্রাপ্ত প্রবণতা এবং পরিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার ফলে অর্জিত প্রবণতা সমূহের পরিপূর্ণ এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

দ্বিতীয়ত, নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে প্রবণতা সমূহের মধ্যে সু-সংহত বোঝাপড়া। অনেক সময় বিভিন্ন প্রবণতার প্রকাশের মধ্যে বিরোধ ঘটতে পারে। সেই বিরোধিতাকে সরিয়ে রেখে পরিস্থিতি অনুযায়ী সমঝোতার মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

তৃতীয়ত, প্রবণতাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া সব সময় এক হয় না, পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ প্রবণতা সমূহের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া পরিবর্তনশীল কারণ লক্ষ্য ও পরিস্থিতি উভয়েই গতিশীল আর যখন সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না তখন সমস্যাকে নিয়েই জীবন অব্যাহত থাকে।

দৈহিক স্বাস্থ্যের মত মানসিক স্বাস্থ্যও মাত্রাগত। মানসিক সু-স্বাস্থ্য ও মানসিক অসুস্থতার মধ্যে নির্দিষ্ট কোন মাপকাঠি নেই। একটি স্কেলের দুই প্রান্তের এক প্রান্তে থাকে মানসিক সু-স্বাস্থ্য আর অপর প্রান্তে থাকে মানসিক অসুস্থতা। মাঝখানে মানসিক স্বাস্থ্যের বিভিন্ন গ্রেড আছে। মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষ্য হল বর্তমান মানসিক অবস্থা থেকে আরও উন্নত মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া। তাই মানসিক স্বাস্থ্য বলতে নির্দিষ্ট বা স্থিতিশীল লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার থেকে ক্রমোন্নত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা—এই ব্যাখ্যাই উত্তম।

● মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Mental Health) ঃ

পরিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ব্যক্তি এগিয়ে চলে। একেই বলে সঙ্গতিবিধান। এই মিথষ্ক্রিয়ার ফল যে সব সময়ই মসৃণ ও বাঞ্ছিত পথ ধরে চলে তা নয়; অনেক প্রতিকূলতা ও বাধা-বিপত্তি দেখা যায় যার ফলে ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব, ব্যর্থতা, হতাশা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে।

একজন মানসিক দিক দিয়ে সুস্থ ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে থেমে থাকে না। সে আরও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে দৃঢ়তার সঙ্গে পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে এগিয়ে যায়। মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তি ব্যর্থতা, হতাশাকে দূরে সরিয়ে রেখে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী মানসিক শক্তি ব্যবহার করে মানসিক চাপকে ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যায়। এইভাবেই ব্যক্তি সঙ্গতিবিধান করে। এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য যে, মানসিক সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তি অবশ্যই সমাজের রীতি-নীতি ও অনুশাসন মেনে চলবেন। সমাজ সমর্থিত আচরণ তিনি করবেন। প্রত্যাশিত মূল্যবোধের তিনি অধিকারী হবেন।

মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যকে সংক্ষিপ্তাকারে ব্যক্ত করা হল—

(১) মানসিক স্বাস্থ্যের স্বরূপ স্থিতিশীল লক্ষ্যে পৌঁছানো নয়, বর্তমান অবস্থা থেকে আরও উন্নত মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে সচেষ্ট হওয়া।

(২) মানসিক স্বাস্থ্য দেহ ও মন উভয়ের উপরই নির্ভর করে কারণ দেহ ও মনের মধ্যে এক নিগূঢ় সম্পর্ক বর্তমান। দেহ অসুস্থ হলে মনের স্বাভাবিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততা, ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৩) মানসিক স্বাস্থ্য সমাজ নিরপেক্ষ নয়। সমাজের অনুশাসন, রীতি-নীতি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(৪) মানসিক স্বাস্থ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল আত্মোপলব্ধি। এর অর্থ হল ব্যক্তি কার্যকরীভাবে লিখতে, পড়তে ও বলতে সক্ষম হবে। মনোযোগের সাথে শুনতে ও পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে বুঝবে এবং তার রক্ষার জন্য সচেষ্ট হবে। অবসর সময়ের কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করবে ও দর্শক রূপে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারবে এবং সুস্থ জীবনাদর্শের অধিকারী হবে।

(৫) মানসিক স্বাস্থ্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল মানসিক সম্পর্ক স্থাপন। মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তি বৈচিত্র্যপূর্ণ সামাজিক জীবন উপভোগ করে। অপরের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে, দলের সঙ্গে গণতান্ত্রিক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে। কেবলমাত্র অন্যান্যদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা নয়, নিজেকেও সে যথার্থভাবে বুঝতে পারে। ক্ষমতাকে সে বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করে। সিদ্ধান্ত সে নিজে নেয় ও তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে রাখার চেষ্টা করে এবং নির্দিষ্ট মাত্রায় মানসিক চাপ সে সহ্য করতে পারে যার ফলে হতাশাকে সে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে।

(৬) মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল আর্থিক উৎকর্ষতা। আর্থিক উৎকর্ষতার দুটি দিক আছে—একজন শিক্ষিত উৎপাদক ও ভোক্তা হওয়া। শিক্ষিত উৎপাদক কাজের মূল্য দেয়। সামাজিক মর্যাদার মূল্য দেয়। বৃত্তি গ্রহণে সে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় এবং নিজ বৃত্তিগত উন্নতিতে সে নিরন্তর সচেষ্ট হয়। শিক্ষিত ভোক্তা পরিকল্পিত আর্থিক জীবন যাপন করে, আয় অনুযায়ী ব্যয় করে এবং একজন দক্ষ ও তথ্যসমৃদ্ধ ক্রেতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে।

(৭) দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়া সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ। দায়িত্বশীল নাগরিক বলতে বোঝায় সকলের স্বার্থের প্রতি সচেতনতা, ব্যক্তি পার্থক্যের প্রতি অনুভূতিশীল হওয়া, আইনের প্রতি অনুগত থাকা, গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো ইত্যাদি। দার্শনিকগণ ও মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীগণ বহুদিন থেকে বলে আসছেন যে আত্মকেন্দ্রিকতা ব্যক্তিকে প্রকৃত সুখের সন্ধান দেয় না। সুখী হতে গেলে স্বার্থ বা আত্মকেন্দ্রিকতাকে একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে হবে। 'কতটা পেয়েছি থেকে কতটা দিয়েছি'—এই বোধই ব্যক্তিকে প্রকৃত সুখের সন্ধান দেয়।

● মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য (Necessity and Objectives of Mental Health) :

প্রতিটি ব্যক্তিসত্তারই দুটি জীবনধারা — ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবন। এই দুটির উপরই মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভরশীল।

ব্যক্তিজীবন — বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির পাশাপাশি মানসিক বিকাশ ঘটতে থাকে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন ও পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে অবিরত মিথষ্ক্রিয়ার (interaction) ফলে তাদের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শিশু তাদের সম্পর্কে সচেতন হতে থাকে। এই সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে। স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা, যত্ন ও উদ্দীপনাযুক্ত পারিবারিক পরিবেশ শিশুর সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তোলে। এই সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশ থেকেই সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্য গড়ে ওঠে যা সার্থক অভিযোজনে অপরিহার্য। অপরদিকে, সুষম ব্যক্তিত্ব গড়ে না উঠলে নানারকম অপসঙ্গতিমূলক আচার-আচরণ প্রকাশ পায়। এই প্রকাশ কখনও খুব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়, আবার কখনও খুব ক্ষীণভাবে এবং মাঝে মাঝে দেখা যায়। এই অপসঙ্গতি ব্যক্তিজীবন, সমাজ জীবন, কর্মজীবন অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি দিকের উপরই ক্ষতির কারণ হয়। জীবনের আনন্দ, মাধুর্য, রূপ, রস, গন্ধ ব্যক্তি উপভোগ করতে পারে না। এই কারণেই উত্তম দৈহিক স্বাস্থ্যের মত উত্তম মানসিক স্বাস্থ্য ব্যক্তিজীবনের পক্ষে অপরিহার্য।

সমাজ জীবন — অপসঙ্গতির কারণে ব্যক্তি সামাজিক নীতি ও আদর্শকে সবসময় মেনে চলে না। সামাজিক অনুশাসন বহির্ভূত চিন্তা ও কর্মের দ্বারা সে সমাজ জীবনের শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বিঘ্নিত করে। তাই ব্যক্তির অসুস্থ মানসিকতা সমাজ মানসিকতাকেও আঘাত করে, যার ফলে ব্যক্তির সমাজ জীবনও বিষাক্ত হয়ে ওঠে। এছাড়া ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যস্ত হলে তার কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। কর্মক্ষমতা হ্রাস পেলে ব্যক্তি তার পরিবার ও সমাজ জীবনে যে পরিমাণ সাহায্য করতে পারত, তা সম্ভব হয় না। ফলে পারিবারিক ও সমাজ জীবনের সমৃদ্ধি ও শান্তি বিঘ্নিত হয়।

● মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives of Mental Health) :

মানসিক স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্য প্রধানত দুটি — (ক) ব্যক্তিমানসের সুস্থতা রক্ষা করা, এবং (খ) সমাজমানসের সুস্থতা রক্ষা করা। আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায়, পারিবারিক জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা, বিদ্যালয়ের শান্তি ও শৃঙ্খলা, বিজ্ঞানভিত্তিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাকে

বাস্তবায়িত করা, সমাজজীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা, জাতির বিকাশকে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে মানবসম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ও তার সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন। একই সঙ্গে বিপথগামী শিশুদের অপসঙ্গতি দূরীকরণ ও পুনর্বাসনের জন্য, কিশোর ও বয়ঃপ্রাপ্ত অপরাধীদের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্য, তাদের অসুস্থ জীবনধারাকে সুস্থতার পথে ফিরিয়ে আনার জন্য, মানসিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের রোগমুক্তির জন্য মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিক থেকে দেখলে মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিষেবামূলক দায়িত্ব। সর্বস্তরের সাধারণ জনগণকে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্পর্কে সচেতন না করলে ব্যবহারিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে তারা অর্থাৎ সাধারণ জনগণ অজ্ঞাত থেকে যাবে, যার ফলে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী জীবনযাপন প্রণালীকে নানাভাবে বিকৃত ও পঙ্গু করে সুষম ও সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধার সৃষ্টি করবে। উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা হল —

(১) ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে আনন্দ ও শান্তি নিয়ে আসা যাতে সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ শিশুর সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে।

(২) শিশুর অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করা প্রয়োজন যাতে সে ইতিবাচক ও নেতিবাচক পরিবেশ চিহ্নিত করতে পারে এবং জীবন-অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে সার্থক অভিযোজনে সক্ষম হয়।

(৩) মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল ব্যক্তি ও সমাজের মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা করা। ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য ও সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যা একদিকে যেমন সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে তেমনই একইসঙ্গে সমাজের মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারেও বিশেষ আগ্রহী হবে।

(৪) ব্যক্তিজীবন ও সমাজ জীবন থেকে বিকৃতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা দূরীকরণ মানসিক স্বাস্থ্যবিদ্যার অন্যতম লক্ষ্য। এর মধ্যে প্রধান হল (ক) বিপথগামী শিশুদের পুনর্বাসন, (খ) অসামাজিক ও অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের পুনর্বাসন, (গ) মানসিক বিকৃতি ও রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের রোগ নিরাময়।

● মানসিক স্বাস্থ্যের নির্ধারকসমূহ (Determinants of Mental Health) ঃ

মানসিক স্বাস্থ্য হল এমন একটি মানসিক সামর্থ্য যার সাহায্যে ব্যক্তি নিজ ক্ষমতানুযায়ী জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সর্বোৎকৃষ্ট সমাধানে প্রয়াসী হয় এবং ন্যূনতম সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজন করতে পারে। ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য যেসব বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয় নীচে সেগুলি উল্লেখ করা হল —

(১) **দৈহিক সুস্থতা (Physical well-being)** — দেহ ও মনের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে আজ সকলেই একমত। দৈহিক সুস্থতা মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দৈহিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে গৃহের অভিভাবক

এবং পিতামাতার ধারণা ও আচরণ যদি সুস্থ না হয় তাহলে শিশুর মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা নাও গড়ে উঠতে পারে, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি অনীহা দেখা দিতে পারে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে উপযুক্ত মনোভাবের অভাব দেখা দিতে পারে যা মানসিক স্বাস্থ্যবিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাই সুষ্ঠু মানসিক স্বাস্থ্যের অন্যতম শর্ত হল দৈহিক সুস্থতা।

(২) **উন্নত গৃহ-পরিবেশ (Good Home Environment)** – উন্নত গৃহ-পরিবেশ বলতে বোঝায় শিশুর প্রতি পরিবারের বয়স্কদের স্নেহ-প্রীতি, যত্ন, উৎসাহ, স্বতঃস্ফূর্তভাব ও পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক। পিতামাতা যদি প্রায়শই কলহ ও মনোমালিন্যের মধ্যে থাকে, তাহলে শিশু নিজেকে অত্যন্ত নিঃসহায় বোধ করে। গৃহ-পরিবেশ এমন হওয়া প্রয়োজন যেখানে শিশুরা তাদের পিতামাতার কাছ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভালবাসা পায় এবং যেখানে তাদের গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদাগুলির যথাযথ পরিতৃপ্তি ঘটে। অপরপক্ষে, গৃহ-পরিবেশ যদি উপযুক্ত না হয় তাহলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়।

(৩) **উন্নত বিদ্যালয় পরিবেশ (Good School Environment)** – বিদ্যালয়ের কার্যাবলীও শিশুর সুষ্ঠু মানসিক স্বাস্থ্যবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় প্রতিটি শিশুর মধ্যে যে সুপ্ত শক্তি আছে সে সম্পর্কে অবহিত হয়ে তার পরিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ঘটানো এবং তার মধ্য দিয়েই সুষম ব্যক্তিত্ব গঠনই শিক্ষার লক্ষ্য। বিদ্যালয়ে শিশুর ব্যবহার, শিক্ষায় পারদর্শিতা, সহপাঠীদের সঙ্গে আচরণ, বিদ্যালয়ে নানাবিধ গঠনাত্মক ক্রিয়াকর্ম শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যবিকাশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বিদ্যালয় পরিবেশে শিশুরা যদি বিভিন্ন সৃজনমূলক কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায় তাহলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শিক্ষার্থীদের বয়স ও মানসিক বিকাশ অনুযায়ী পাঠক্রম, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা শিক্ষার্থীর সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে প্রয়োজন যা শিক্ষার্থীর উন্নত মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে সহায়ককারী।

(৪) **উন্নত সামাজিক পরিবেশ (Good Social Environment)** – শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে তার সামাজিক পরিবেশের যথেষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। উন্নত সামাজিক পরিবেশ বলতে আমরা সেই পরিবেশকে বুঝি যেখানে জনসাধারণের জীবনযাত্রার নৈতিক মান উন্নত। এইরূপ সামাজিক পরিবেশে বাস করার ফলে শিশু গুরুজনদের নিকট থেকে আদর্শ জীবনযাত্রার রীতি-নীতি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সেও বড়দের অনুকরণ করে, যার ফলে তার মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।

(৫) **ব্যক্তির আত্মোপলব্ধির ক্ষমতার বিকাশ (Development of self realisation)** – ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি অর্থাৎ নিজেকে সঠিকভাবে চেনা তার মানসিক স্বাস্থ্যকে সঠিকভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সঠিকভাবে চেনা বলতে বোঝায় নিজের ক্ষমতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে ব্যক্তির সচেতন হওয়া। এর ফলে ব্যক্তি তার উচ্চাশাকে নির্দিষ্ট সীমায় বেঁধে রাখে, হতাশা ও ব্যর্থতাকে দূরে সরিয়ে রাখে যা উন্নত মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

● **মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষা (Mental Health and Education) :**

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ব্যক্তিকে সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী তখনই বলা যাবে যখন সে দৈহিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। দৈহিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা, কিভাবে দৈহিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায়, রোগ প্রতিষেধক ইত্যাদি সম্পর্কিত বহু তথ্য পাঠক্রম ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা হয়। অর্থাৎ প্রথাগত শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাদি আছে। মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা, কিভাবে মানসিক সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় সে সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে নেই। অথচ উভয় ধরনের স্বাস্থ্যই আমাদের সম্পদ ও সমগুরুত্ব সম্পন্ন। বর্তমান সমাজব্যবস্থার জটিলতা শিক্ষার্থীদের উপরে প্রচণ্ড মানসিক চাপের কারণ হয়ে উঠছে যার ফলে অপরাধপরায়ণতা, মাদকাসক্তি, আত্মহত্যা, আন্ডার অ্যাচিভমেণ্ট এবং পঠনকাল সমাপ্ত হওয়ার আগেই বিদ্যালয় ত্যাগের (drop out) সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রতি ২০ জন ছাত্রের মধ্যে একজন কোন না কোন সময়ে মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়েছে। এইসব মানসিক অসুস্থ শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিকদের দ্বারা চিকিৎসা করার মত যথেষ্ট সংখ্যক চিকিৎসক নেই। অভিভাবকদের আর্থিক সামর্থ্যও নেই। তাই প্রয়োজন হয়ে উঠেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা এবং মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই কাজের দায়িত্ব শিক্ষকরাই গ্রহণ করবেন। কিভাবে শিক্ষকগণ এই কাজ পালন করতে পারেন তার কিছু রূপরেখা নীচে উল্লেখ করা হল—

(১) শিক্ষকের প্রথম কাজ হল মানসিক স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শ্রেণী বিন্যাস করা, যেমন—

(ক) স্বাভাবিক মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন শিক্ষার্থী,

(খ) আংশিকভাবে ক্ষুণ্ণ মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন শিক্ষার্থী, এবং

(গ) মানসিক অসুস্থ শিক্ষার্থী।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে কিভাবে এই শ্রেণীভাগ করা হবে। সাধারণত গুণগতভাবে অর্থাৎ আচরণের প্রেক্ষিতে ভাগ করা যেতে পারে।

বিদ্যালয়ে যেসব শিক্ষার্থী প্রত্যাশিত আচরণ করে তাদের স্বাভাবিক মানসিক স্বাস্থ্য সম্পন্ন বলা যায়।

অত্যন্ত লাজুক, আলস্যপরায়ণ, ঘন ঘন অনুপস্থিত, পঠন-পাঠনে মারাত্মক অমনোযোগী, কোন কিছুতে মনঃসংযোগে অক্ষম, সহ-পাঠীদের ও শিক্ষকদের সঙ্গে স্বাভাবিক হতে অক্ষম, নিজেক সর্বদা দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, বয়স অনুযায়ী আগ্রহের অভাব—এইসব শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ আংশিকভাবে ক্ষুণ্ণ মানসিক স্বাস্থ্য সম্পন্ন শিক্ষার্থী হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

তৃতীয় স্তরে আছে সেইসব শিক্ষার্থী যাদের আচরণ অস্বাভাবিক, শ্রেণীকক্ষের কার্যাবলীর প্রতি যাদের কোন প্রতিক্রিয়া নেই, যাদের উপস্থিতি শ্রেণীর পক্ষে বিপজ্জনক, যারা সমাজে নানারকম অবাঞ্ছিত কাজ করে ইত্যাদি। এদেরকেই মানসিক অসুস্থ শিক্ষার্থী হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

উপরিউক্ত গুণগত অর্থাৎ বাহ্যিক লক্ষণ ছাড়াও পরিমাণগতভাবে মানসিক অসুস্থতা নির্ণয়কারী মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা দ্বারাও শিক্ষার্থীদের শ্রেণীভাগ করা যেতে পারে।

(২) শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য অনুযায়ী বিভক্ত করার পর মানসিক স্বাস্থ্য উন্নত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানসিক স্বাস্থ্য সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে নীচে যার উল্লেখ করা হল।

▶ স্বাভাবিক মানসিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন শিক্ষার্থী (Students with normal mental health) :

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং আরও উন্নত মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে —

(ক) মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করতে হবে। এই কাজটি দলগত নির্দেশনার মাধ্যমে করা যেতে পারে।

(খ) কিভাবে জটিল পরিস্থিতিতে সঙ্গতিবিধান করতে হয় সে সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

(গ) কতকগুলি মৌলিক চাহিদা, যেমন—ভালবাসার চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা ইত্যাদি পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) সমাজ জীবনে যেসব চাহিদার উদ্ভব হয় সেগুলি পূরণের জন্য পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা করতে হবে এবং ঐ সকল কার্যাবলীতে যাতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে তা নিশ্চিত করতে হবে। এই চাহিদাগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল—আত্মমর্যাদার চাহিদা, সঙ্গীর চাহিদা, নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের চাহিদা, সাফল্যের চাহিদা ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বয়ঃসন্ধিক্ষণে যে বিশেষ চাহিদাগুলি দেখা দেয় তা পূরণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

(ঙ) মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য শিক্ষার্থীদের সাফল্যের চাহিদার পাশাপাশি স্বল্পমাত্রায় ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার পরিবেশ তৈরী করতে হবে। শিক্ষার্থীদের কাজে সাফল্য দেখা দিলে মাঝে মধ্যে শিক্ষক প্রশংসা থেকে বিরত থাকবেন। তাৎক্ষণিক লক্ষ্যের পরিবর্তে দূরবর্তী লক্ষ্য অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীদের সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিয়ে তাদের নিজেদের সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

▶ আংশিকভাবে ক্ষুণ্ণ মানসিক স্বাস্থ্য সম্পন্ন শিক্ষার্থী (Students with partially disturbed mental health) :

দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষার্থীরা অর্থাৎ যাদের মানসিক স্বাস্থ্য আংশিকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে তারা শিক্ষকের নিকট সমস্যা। কারণ তারা স্বাভাবিকও নয় আবার অসুস্থও নয় যে তাদের

মনোচিকিৎসকের নিকট পাঠাতে হবে। বিদ্যালয়েই বিশেষ কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাদের স্বাভাবিক করে তুলতে হবে। এই ব্যবস্থাগুলি হল—

(ক) স্বাভাবিকদের ক্ষেত্রে যেসব মৌলিক এবং বিশেষ চাহিদা পূরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি এদের ক্ষেত্রে শুধু প্রয়োজনীয় নয়, আরও গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) এদের জন্য প্রতিরোধ এবং প্রতিকার উভয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) প্রতিকারের জন্য অস্বাভাবিক আচরণগুলিকে নির্দিষ্ট করে, কারণ অনুসন্ধান করে সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই কাজটি বিদ্যালয়ের নির্দেশনা বিভাগ পরামর্শদানের সাহায্যে সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিতে পারে।

(ঘ) এই ধরনের শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতা বা অভিভাবকের সঙ্গে শিক্ষকগণ যোগাযোগ স্থাপন করে গৃহে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে সুপারিশ করবেন।

(ঙ) বিভিন্ন ধরনের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীতে যাতে এরা অংশগ্রহণ করে সে ব্যাপারে শিক্ষকগণ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(চ) কোন রকম কঠোর শাসন এদের পক্ষে ক্ষতিকারক। সর্বদা উৎসাহ ও বোঝানোর পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

(ছ) মানবজীবন প্রকৃতির আশীর্বাদ। সমাজসমর্থিত আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে সেই জীবনের রূপ, রস ও গন্ধ উপভোগ করাই যে জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্য সে কথা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের বোঝাতে হবে।

▶ **মানসিক অসুস্থ শিক্ষার্থী (Students with disturbed mental health) :**

তৃতীয় স্তরের শিক্ষার্থী অর্থাৎ যারা মানসিক অসুস্থ তাদের জন্য শিক্ষকদের বিশেষ কিছু করার নেই। এদের চিহ্নিত করে অভিভাবকদের জানাতে হবে এবং মনোচিকিৎসকের কাছে প্রেরণের সুপারিশ করতে হবে। সুস্থ হবার পূর্বে যাতে তাদের বিদ্যালয়ে অভিভাবকরা প্রেরণ না করেন সে ব্যাপারে অভিভাবকদের বোঝাতে হবে। বিদ্যালয়ের পরামর্শ বিভাগ শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট চিকিৎসকের নাম, কিভাবে তাঁকে দেখানো যেতে পারে—সে সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করবেন।

সব শেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিক্ষার্থীদের উন্নত মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে শিক্ষককে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার পূর্বে মানসিক স্বাস্থ্য, এর গতি-প্রকৃতি, মানসিক রোগের শ্রেণী বিভাগ, তার প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়া উচিত। অন্যথায় অনেক ক্ষেত্রেই ভ্রান্তি ঘটতে পারে যা শিক্ষার্থীর পক্ষে আরও বেশি ক্ষতিকর।

● **শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার্থে বিদ্যালয়ের ভূমিকা (Role of School to maintain the Mental Health of Student) :**

শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুসংহত ব্যক্তিত্ব বিকাশে ও তার রক্ষার জন্য গৃহের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এ ব্যাপারে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। তবে বর্তমান বিশ্বে দ্রুত

শিল্পায়নের ফলে পরিবার ক্রমশ ক্ষুদ্র হচ্ছে, পিতা-মাতার সময়ের অভাব ইত্যাদি কারণে পরিবার সঠিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে না। তাছাড়া আমাদের দেশের সাধারণ জনগণের একটা বড় অংশ এখনও নিরক্ষর এবং অল্পশিক্ষিত, যাদের পক্ষে শিশুর সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে উপযুক্ত ভূমিকা পালন করা সম্ভব নয়। শিশু মনস্তত্ত্বের উপর অধিকাংশ পিতা-মাতার জ্ঞান খুবই সীমিত এবং বিক্ষিপ্ত যা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে কোন রকম কাজে তো আসেই না উপরন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক গতিও ব্যাহত হয়। এই রকম অবস্থায় বিদ্যালয়কে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হচ্ছে। বিদ্যালয়ে শিশু ৬-৭ ঘণ্টা অতিবাহিত করে। শিশুর বিভিন্ন রকম চাহিদা পূরণের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয় তার মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারে। কিভাবে বিদ্যালয় শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য গঠনে সাহায্য করতে পারে তা নিম্নে আলোচনা করা হল।

(১) **বিদ্যালয় পরিবেশ**—শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে বিদ্যালয় পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমস্ত রকমের জাত-পাত, ধর্মীয় বিভেদ থেকে বিদ্যালয়কে মুক্ত রাখতে হবে। জাত-পাত, আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলের জন্যই নিরাপত্তাবোধের বাতাবরণ তৈরী করতে হবে। হতাশা, ভীতি, চাপ ইত্যাদিকে দূরে সরিয়ে রেখে বিদ্যালয়ে শিখনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

(২) **গণতান্ত্রিক পরিবেশ**—বিদ্যালয় গণতান্ত্রিক পথে চলবে। বিভিন্ন কমিটিতে ছাত্র-প্রতিনিধি নিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হতে হবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে পারবে।

(৩) **সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী**—শিক্ষার্থীদের বদ্ধ আবেগগুলি যাতে মুক্ত হতে পারে সেজন্য বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) **শিক্ষকের ভূমিকা**—শিক্ষার্থীর ছোটখাটো সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তির আচরণের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষককে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তিনি অবশ্যই শিক্ষার্থীদের শুভানুধ্যায়ী হবেন এবং শিক্ষাদানকালে নিষ্ঠাবান হবেন। শিক্ষার্থীদের জীবন-দর্শন গঠনে তাকে উদ্যোগী হতে হবে। শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে।

(৫) **বক্তব্য প্রকাশে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা**—বক্তব্য প্রকাশে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দিতে হবে। তারা যাতে নির্ভয়ে সব কথা বলতে পারে তার আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে।

(৬) **বিভিন্ন দিকে আগ্রহ**—খেলাধূলা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সমাজসেবামূলক কাজ এবং বিভিন্ন 'হবি' বিকাশে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বিকাশে সচেষ্ট হবেন।

(৭) **শ্রেণীকক্ষে মানবিক সম্পর্ক গঠন**—মানবিক সম্পর্ক গঠনের উপর 'ক্লাশ' করা যেতে পারে। এই 'ক্লাশে' মানবিক সম্পর্ক সম্পর্কিত তাত্ত্বিক আলোচনা হবে। পাশাপাশি দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলির চরিত্র, সমাধানের পন্থা ইত্যাদির উপর আলোচনা করা হবে।

(৮) **নীতি এবং যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা**—বয়ঃসন্ধিক্ষণের অধিকাংশ সমস্যাই নৈতিকতা ও যৌনতা সম্পর্কিত অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল। এগুলি সুস্থ মানসিক স্বাস্থ্যের অন্তরায়। তাই নৈতিকতা ও যৌনশিক্ষা এদের নিকট বিশেষ কার্যকরী।

(৯) **শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি**—শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হতে পারে। সেজন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দেবেন।

(১০) **নির্দেশনা**—শিক্ষার্থীদের স্বার্থে বিদ্যালয়ে নির্দেশনা কর্মসূচী সংগঠন করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থীদের সুস্থ মানসিক বিকাশে কতকগুলি কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) **আলোচনা পদ্ধতি ঃ** এই ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের অভিযোজন সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা থাকে। সকল শিক্ষক, অধ্যক্ষ, সামাজিক কর্মীর উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীর সমস্যা সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। সতর্কতার সঙ্গে তথ্যাদি বিশ্লেষণ করার পর সমস্যা সমাধানের পন্থা সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়।

(২) **ডেলাওয়ারে (Delaware) মানব সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ক্লাশ ঃ** সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য H. E. Bullis এই পরিকল্পনাটি করেন। সপ্তাহে একদিন শিক্ষক শ্রেণীতে আবেগগত সমস্যার উপর একটি গল্প বলেন। এই গল্পের উপর স্বাধীনভাবে ছাত্রদের আলোচনা করতে উৎসাহ দেওয়া হয়। তারা গল্পটিকে বিশ্লেষণ করে। এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল গল্পে ব্যক্ত সমস্যার সদৃশ কোন ঘটনা ছাত্র নিজের জীবন থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করে। এর মূল উদ্দেশ্য হল আবেগগত সমস্যা থেকে ছাত্রকে মুক্ত করে আনা এবং সমস্যাকে গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করা।

(৩) **টুলশা (Tulsa) মানবিক সম্পর্কের উপর কোর্স ঃ** এই কোর্সটি বয়ঃসন্ধিক্ষণের ছেলে-মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। শ্রেণীকক্ষে নিম্নলিখিতভাবে সাধারণ সমস্যাগুলি আলোচিত হয়।

(ক) শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলির তালিকা প্রস্তুত করে।

(খ) যেসব আচরণগুলি দেখা যায় সেগুলির উপর আলোচনা হয়।

(গ) ফিল্ম ও স্লাইড দেখানো হয়।

(ঘ) সংশোধনের উপর 'ক্লাশ' হয়। সমস্যাক্রান্ত শিক্ষার্থীরা এই ক্লাশে অংশগ্রহণ করে।